বাংলাভাগ ও বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কোরিয় প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণ

ড: মর্তুজা খালেদ

সিউলের চিঠি-৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সালে ১৫ আগস্ট স্বাধীন কোরিয়ার উভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু সোভিয়েত প্রভাবিত উত্তর অংশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত দক্ষিণ অংশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু হয়। এভাবে বস্তুত: ১৯৪৬ সালের শেষেই বস্তুতঃ কোরিয়া বিভক্ত হয়। যদিও উপদ্বীপ আনুষ্ঠানিকাভাবে বিভক্ত হয় ১৯৪৮ সালে। বিভক্ত কোরিয়াকে শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৯৫০ সালে শুরু হয় কোরিয় যুদ্ধ ---- যা ছিল এক মর্মান্তিক বিষয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির ভিতর দিয়ে ১৯৫৩ সালে এই ফলাফলবিহীন যুদ্ধ শেষ হয়।

আজ ছয় দশক কোরিয়া উপদ্বীপ দুইটি দেশে বিভক্ত কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো উভয় কোরিয়ার জনগণের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ, ঘৃণা বা অবজ্ঞা নেই। দুই কোরিয়ার মানুষই মনে করে তারা একই মায়ের সন্তান ঘটনা চক্রে তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। উত্তর কোরিয়ায় বন্যা বা দুর্ঘটনায় প্রাণহানী ঘটলে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিটি মানুষের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। কোরিয় যুদ্ধের পর থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উভয় কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে। দক্ষিণ কোরিয়ার যে কোন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে তার উত্তর কোরিয় নীতি ও উভয় কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গড়ার জন্য তিনি কি কৌশল অবলম্বন করবেন তা জাতির সামনে ব্যাখ্যা করতে হয়। ১৯৬০ দশকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মিনিস্ট্রি অব ইউনিফিকেশন (Ministry of Unification)---- যে মন্ত্রণালয় কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। কোরিয়া ঐক্য প্রসঙ্গে প্রতিটি কোরিয়া জনগণের ধারণা সিউলের সোগাং বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সাং-উ রীর মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়। "Will Korea be reunified? Will the process of reunification be peaceful? My answer to borth questions is affirmative. Sooner or later."[1]

কোরিয়ার মতো একইভাবে বাঙালী জাতি ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হয়েছে। বাংলা ভেঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। কোরিয়ার মতো দুই বাংলা এক করার বিষয় বর্তমানে বাংলাদেশের কোন বাঙালীর বলাতো দূরের কথা কল্পনাতেও ঠাঁই দেয় না। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের যেমন রয়েছে বাংলাদেশের বাঙালীদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মনোভাবসহ উচ্চবর্ণীয় এক ধরনের আভিজাত্য বোধ----- তাদের কাছেও এটিও একটি হাস্যকর বিষয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান একই শ্রেণীভুক্ত। শত শত বছর তারা একসাথে একই সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছে। আজ এটা প্রমাণীত যে বাংলার মুসলমানগণ কোন বাহিরাগত জাতির বংশধর নয় বরং তারাও এই মাটিরই সন্তান। সুতরাং প্রশ্ন দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক যে কেন এমন হলো? আর এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলা বিভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শরৎ বোস প্রমুখ নেতারা ঐক্যবদ্ধ বাংলা প্রতিষ্ঠার এক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তাদের এই চেষ্টাই বা সফল হয় নি কেন?

এ সকল ঐতিহাসিক প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, বাঙালীর এই বিভক্তির জন্য দায়ী ছিল অসমানভাবে বেড়ে ওঠা বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান মধ্যবিক্ত শ্রেণী। যে কোন রাষ্ট্র ও সমাজের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো সে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। দু:খজনক হলেও সত্য যে, বাঙালী সমাজের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেড়ে উঠেছিল ধর্মের ভিত্তিতে এবং অসমভাবে। মানব দেহের এক পা যদি অসমভাবে বড় হয় তা যেমন সে দেহকে পঙ্গুতে রূপান্তরিত করে তেমনি ধর্মের ভিত্তিতে বেড়ে উঠা বাঙালী মধ্যবিক্ত শ্রেণী অসমবিকাশ ছিল বাংলাভাগের মূল কারণ। বাংলা ভাগ হয়েছিল দুইবার প্রথম ১৯০৫ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির ফলে। প্রথমবার বাংলা বিভক্তির পর বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেকটা শ্রেণী স্বার্থেই তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। তারা এই বিভক্তিকে অভিহিত করেছিল বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হিসাবে। ১৯০৫ সালে বাংলা

বিভক্তির ফলে বাঙালী হিন্দুর স্বদেশ প্রেম উথলে উঠেছিল। বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ দেশাত্ববোধক সঙ্গীতগুলি এই সময় রচিত হয়েছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা," "বাংলার মাটি, বাংলার বায়ু পূণ্য হউক-- হে ভগবান," আর "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"---- মতো গান যা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচনা করেন, "ধন্যধান্যে পুষ্পে ভরা, আমদের এই বসুন্ধরা তাদের মঝে আছে যে দেশ সকল দেশের সেরা" মতো সঙ্গীত যা কালের বাধা অতিক্রম করে যে কোন বয়সের যে কোন বাঙালীকে উদ্বেলিত করে। ১৯০৫ যে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙলা বিভক্তির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল তারাই ১৯৪৭ সালে বাঙলাকে ভাগ করেছিল, কিন্তু কেন? বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়গুলির জবাব খোঁজা হয়েছে।

বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব

বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠার প্রেক্ষাপট গৌরবজনক নয়। এ শ্রেণী বেড়ে উঠার ইতিহাস মোসাহেবী, চাটুকারিতা আর কপটতায় ভরা। উনিশ শতকের শেষে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ঘৃণাভরে লিখেছেন,

> জগদীশ্বর কৃপায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙালী নামে এক অদ্ভুদ জন্তু এই জগতে দেখা দিয়াছে। পশুতত্ববিৎ পন্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত, হস্তে পদে পাঁচ-পাঁদ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক 'বাইমেনা' জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সন্মন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, তাহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু (কতিপয় লাল দাড়িবিশিষ্ট ঋষির মতো)। বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তোলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তির করিয়া সংগ্রহ পূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙালি চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুত, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দভ হইতে গর্জন--- এই সকল একত্র করিয়া দিঙ্মন্ডল উজ্জ্বলকারী , ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন।[২]

মুসলিম শাসনামলে উপমহাদেশসহ বাংলাদেশে শিক্ষিত, স্বচ্ছল ও রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব অজানা ছিল।[৩] বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে নতুন ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে তাতে বাঙালী সমাজের নবোদ্ভূত শক্তিগুলো ইংরেজ শাসকদের সহযোগী একটি শ্রেণী হিসেবে বিকশিত হয়।[৪] অবশ্য এ শ্রেণী সৃষ্টির পটভূমি রচিত হয়েছিল আরও পূর্বে মুর্শিদ কুলী খান কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ভূমি ব্যবস্থা প্রর্বতনের সময় থেকে। মোগল শাসনামলে বাংলার সমাজ বিভক্ত ছিল দুই শ্রেণীতে। শাসক অভিজাত শ্রেণীর যার অন্তর্গত ছিল বিদেশী তুর্কী, আফগান ও পারসিক মুসলমানগণ। এরা ছিল বিদেশ থেকে আসা অবাঙালী মুসলমান। সমগ্র মোগল শাসনামলে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র। স্থানীয় জনগণ তা হিন্দু বা মুসলমান--হোক প্রশাসনিক কার্য থেকে দূরে রাখা হতো। এ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল সুবাদার-দেওয়ান-জায়গিরদার-আমলা-কর্মচারীদের পিরামিড সাদৃশ্য বিরাট এক প্রশাসনিক কাঠামো ও সেনাবাহিনীর উপর--- কোন বাঙালী সমাজের আভ্যন্তরীণ বিশেষ কোন শ্রেণী বা জনস্তরের উপর নয়।[৫]

মুর্শিদ কুলী খান বাংলার এই শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটান। ১৭০০ সালে মোঘল শাসনের ক্রান্তিলগ্নে মুর্শিদ কুলী খানকে সুবা বাংলার দিউয়ান নিযুক্ত করেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। সে সময় বাংলা থেকে যে রাজস্ব আসতো তা প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচ করা অর্থের চাইতে কম ছিল। অন্য সুবা থেকে অর্থ এনে এর ঘাটতি পূরণ করা হতো। মুর্শিদ কুলী খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর, প্রশাসনিক কাজে তুর্কী আফগান ও পারসিকদের স্থলে স্থানীয় বাঙালী হিন্দু

অভিজাতদের নিয়োগ দান করা শুরু করেন। তার অন্যতম কৃতিত্ব ছিল নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রর্বতন। তিনি ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করে সেগুলিকে ২৫টি জমিদারী ও ১৩টি জায়গীরে রূপান্তর করেন।[৬] মুর্শিদ কুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের ফলে অচিরেই বাংলায় প্রশাসক ছাড়াও জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে স্থানীয় বাঙালী হিন্দু অভিজাতগণ। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলের ইতিহাসে এই প্রথম গুনগত এক পরিবর্তন আনেন মুর্শিদ কুলী খান--- রচিত হয় বাঙালী অভিজাত ও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির পটভূমি।[৭]

বরাবর ভারত উপমহাদেশে বিদেশী শাসক ও শাসন সম্পর্কে এ দেশীয় অধিবাসীদের কোন বৈরী মনোভাব ছিল না। ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল স্কট তার বন্ধু মি. নোবেলকে লিখেছিলেন, "হিন্দু রাজারা এবং দেশীয় লোকেরা মুসলমান শাসকদের প্রতি বিরূপ ছিল, এবং গোপনে তারা শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা করতো ও তাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার সুযোগ খুঁজতো।"[৮] নবাবি বা প্রাক-নবাবি যুগে যদিও বাংলাদেশ ছিল, কিন্তু আধুনিক অর্থে কোন বাঙালী জাতি ছিল না। তখন এ দেশীয় জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশ্ববাদী।[৯] বিদেশী হিসেবে পলাশী পরিবর্তনে ক্লাইভের ভূমিকাকে দিল্লীর সম্রাট বা সমকালীন বাঙালী অভিজাত শ্রেণী বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন নি।[১০] স্থানীয় বাঙালী অভিজাত শ্রেণী বরং এগিয়ে গিয়েছিল বৈদেশিক শক্তিকে সহায়তা করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অধিকতর সংহত করার জন্য।

আঠারো শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া শুরু করে তার প্রভাব এই উপমহাদেশে এসেও লাগে। শিল্প বিপ্লবে সৃষ্ট যান্ত্রিক পণ্য নিয়ে এদেশে আসা শুরু করে ডাচ, ফ্রেঞ্চ, পর্তুগীজ এবং সবার শেষে ইংরেজ বণিকগণ। বাংলার কলকাতা, শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় গড়ে উঠে তাদের বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পণ্য বিক্রি করা ছাড়াও তারা কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষকে ব্যবহার করা শুরু করে। শত শত বছর থেকে বিদ্যমান এ দেশীয় বিনিময়ভিত্তিক গ্রাম কেন্দ্রীক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া শুরু করে।[১১] মুদ্রাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ ঘটা শুরু করে। বিদেশী বণিকদের সাথে রপ্তানী বাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে পড়ে এ দেশীয় নতুন এক বণিক শ্রেণী। আঠারো শতকে বাঙলায় নবাব, রাজা-মহারাজা, জায়গিরদার জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সরবরাহ বণিকদের বিশেষ বিকাশ ঘটে এবং তারা একটি উদীয়মান শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।[১২] বাণিজ্য ছাড়াও ব্যাঙ্কিং কারবার থেকে তারা খুব দ্রুতই অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়। সদ্য উত্থিত এই ধনাঢ্য শ্রেণী সনাতন মুগল অভিজাত শ্রেণীর চেয়ে অধিকতর অগ্রসর, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখার প্রয়াস পায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর রাষ্ট্রক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যায়। কোম্পানী শাসনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় সর্বোচ্চ পরিমাণে রাজস্ব আদায়। রাজস্বের উৎস ভূমি থেকে আরও অধিক হারে কর আদায়ের উদ্দেশ্যে তারা ১৭৯৩ সালে প্রর্বতন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো। একদিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারদের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবী এবং অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন এলাকার কৃষক বিদ্রোহ দমন এবং অন্যান্য যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোম্পানীর প্রয়োজন, এ দুই মেটানোর ক্ষেত্রে কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেকাংশে কার্যকরী হয়। [১৩] এ বন্দোবস্তের নীতিতে সাড়া দিয়ে নবাবী আমলে সৃষ্ট হিন্দু অভিজাত ও জমিদারেরা নতুন করে জমিদারে রূপান্তরিত হয়ে ভূমির উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কর ধার্য করা হয়েছিল ভূমি জরিপ না করে এবং এ বন্তোবস্তে জমিদারগণ উচ্চহারে কর দেবার অঙ্গীকারে জমিদারী গ্রহণ করেছিলেন। সে পরিমাণে কর জমিদারী থেকে আদায় না হওয়ায় জমিদারেরা সংকটে পতিত হন। এ ছাড়া ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরনো ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণী যার ভাগ্য মুসলিম রাজশক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল সে শ্রেণী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, উদ্ভব হয় নতুন এক অভিজাত শ্রেণীর।[১৪] এ অভিজাত মুসলমানদের পতনের অপর কারণ ছিল কোম্পানী কর্তৃক লাখেরাজ সম্পত্তি গ্রাস। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিষ্কর লাখেরাজ জমি ভোগ করতেন। হিন্দুরা বিদেশী মুসলিম ও পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনাধীনে থাকায় সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতন

থাকতো, তাদের সম্পদের দলির দস্তাবেজ রক্ষা করতেন। নিজেদের শাসকের জাত বিবেচনা করে মুসলমান অভিজাতগণ দলিল রক্ষার বিষয়ে হিন্দুদের মতো সচেতন ছিল না। ফলে দুর্বল দলিলের অজুহাতে কোম্পানী ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নানা কৌশলে বহু লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এর ফলে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় মুসলিম অভিজাতগণ।[১৫] এভাবে আঠারো শতকের শেষে মোগল আমলের মুসলিম অভিজাত সামন্তশ্রেণী ধ্বংস হয়ে যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট মূলত হিন্দু জমিদার শ্রেণীর পতন ঘটাও শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সূর্যাস্ত আইনের ফলে। কোথাও কোথাও জমিদারের নতুন উদীয়মান ব্যবসায়ীর শ্রেণীর কাজে তাদের জমিদারীর একাংশ বিক্রি করে তাদের জমিদারী রক্ষা করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো ও তা থেকে অর্থ আদায় করার ক্ষেত্রে কোম্পানীর কঠোর আইনের ফলে অচিরেই বাংলায় অনেক স্তর বিশিষ্ট্য মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণী ব্রিটিশ সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করেছিল। বিষয় ঘোষের মতে, "উনিশ শতকে একশ্রেণীর ধনিক বাঙালির হাতে পর্যাপ্ত মূলধনও ছিল। এই ধনিক বাঙালিরা ইংরেজদের সংস্পর্শে নানাবিধ কাজকর্ম করে আঠারো শতকের মধ্যেই প্রভূত ধনসঞ্চয় করেছিলেন।"[১৬] এভাবে তাদের সঞ্চিত সম্পদ তারা পুনরায় বাণিজ্য বা শিল্পে ক্ষিনিয়োগ না করে তা জমিদারী বা তার অংশবিশেষ ক্রয়ের মতো অনুপাদনশীল খাতে তা বিনিয়োগ করে। "যে-পথে ধনিক বাঙালির ধনসঞ্চয় করেছেন সে-পথ নোংরা অলিগলিপথ, চোরাগলি পথ, সর্পিল ও সংকীর্ণ পথ। শিল্পোদ্যমবা উচ্চাকাঙ্খী কোন পরিকল্পনা গ্রহণের কোন দূরদর্শীতা বা মনোভাব তাদের ছিল না। তারা তাদের অর্জিত সম্পদ বিনিযোগ করে সহজ মাধ্যম ভূমিতে।"[১৭] আসলে উনিশ শতকে সমাজ ব্যবস্থায় ভূমি মালিক ও জমিদারীর অধিকারী হওয়া একটি অত্যন্ত সম্মানজনক বিষয় হয়ে দাঁয়িয়েছিল এবং বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্মান ও আয়ের এই সহজ মাধ্যমটিকে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে।

এভাবে দেখা যায় উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ঔপনিবেশিক শাসকদের সহায়ক শ্রেণী হিসেবে বাংলায় নতুন এক সম্পদশালী শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে তার সদস্য ছিল মূলত অভিজাত হিন্দুগণ। উনিশ শতকের প্রথম থেকে কলকাতা শহর বাংলার রাজধানী ও শক্তিশালী একটি বাণিজ্যিক শহর হিসেবে বিকাশ লাভ করা শুরু করে এবং উদীয়মান এই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী কলকাতা ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বাড়ী নির্মাণসহ সম্পক্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়।

(অষ্টাদশ শতকের কোলকাতা)

তারা এ এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে। এ সময় কলকাতা শহরে বসতি স্থাপনকারী পরিবারগুলির অন্যতম ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, শোভাবাজারের রাজ পরিবার, হাটখোলার দত্ত পরিবার, কলুটোলার শীল পরিবার, রামবাগানের দত্ত পরিবার, বহুবাজারের বন্দোপাধ্যায় পরিবার, কলুটোলার সেন পরিবার ও সলাঙ্গার দত্ত পরিবার ছিল অন্যতম।[১৮]

তারা ছিল ব্রিটিশ শাসকদের সবচাইতে বড় সহযোগী সম্প্রদায়। এ শতকে সরকারী ভাষা হিসেবে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী প্রবর্তিত হবার পর বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা খুব দ্রুতই আয়ত্ব করে। অবশ্য অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে বাঙালী ইংরেজী শিক্ষা আয়ত্ব করার ক্ষেত্রে উদ্যগী হয়। কিছু কিছু ইংরেজ এ দেশে এসে ইংরেজী শিখার স্কুল খুলে বসে। ইংরেজী শিক্ষার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত

হয় ১৮১৩ সাল থেকে সরকারী উদ্যোগে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সিদ্ধান্ত করার ফলে।[১৯] ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বাঙালীর ইংরেজীসহ পাশ্চাত্য শাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের পথ সুযোগ হয়। ১৮৩৫ সালে পর থেকে রাষ্ট্রীয় কাজে ইংরেজী ব্যবহার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তিত হলে দেশীয় লোকদের সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দানের নীতি গ্রহণ করে। ফলে এক নতুন প্রশাসনিক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটে। বিনয় ঘোষের মতে, "ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির বিকাশ ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৩৫ সালের মধ্যে তার আকার বড় না হলেও, একেবারে নগণ্য ছিল না।"[২০] মোক্তার, মুনসেফ, কালেক্টরেট সরকারী আমলা প্রভৃতি পেশা গ্রহণের সুযোগ ঘটে এ দেশীয় জনগণের। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল কোলকাতা কেন্দ্রীক এবং কোলকাতা নগরকে কেন্দ্র করেনই তাদের বিকাশ ঘটে। কিন্তু কলকাতার কর্মজীবন শিল্পকেন্দ্রিক ছিল না, ছিল বাণিজ্য ও প্রশাসনকেন্দ্রীক ফলে কোলকাতার নাগরিক জীবনের বিকাশের সাথে সাথে এক ধরনের অশিল্পকেন্দ্রিক প্রশাসনিক চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই চাকুরী লাভকারী শ্রেণীর মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বল্প বেতনভোগী বিচিত্র এক ধরনের কর্মচারী যারা এক অর্থে কেরানী নামে অভিহিত করা যায়। আসলে কেরানী নামে যারা অভিহিত হতেন তাদের মধ্যে ছিল `Writer' `Clerk' `Copyist' প্রভৃতি পেশার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ।

রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটা শুরু হয়

১৮৪০-এর গোড়ার দিকে জনৈক বিদেশী পর্যটক কলকাতা শহরে ককারেল কোম্পানীর অফিসের কেরানীদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

> In the lobby of the office, there are probably eight or a dozen native writers, some of them are seated on the ground with legs across, and having little books on their knee or on a small box before them, others are seated at desks; some of these Bengalis are writing in their own language, others in English, their wages are form four to ten rupees monthly. In the common room, there are say five or six East Indian `writers', having salaries of and from sixty to one hundred rupees, adn generally there are about a dozen native writers, who have from eight to twenty rupees a nonth. On the upper. On the upper floor are the European partners and European clerks rooms.[21]

দেশী বিদেশী সওদাগরি অফিসে সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে বাঙালী কেরানীদের সংখ্যা উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের কোলকাতায় বেশ বড় আকারের ছিল। তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল শাদা ধুতি চাদর বেনিয়ান। কেরানী বাবুরা ধুতি পরতেন বেশ লম্বা করে কোঁচা দুলিয়ে।

(উনিশ শতকের কোলকাতার প্রধান সড়ক)

এ ছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পর্বের চাকুরীজীবী বাঙালী হিন্দু নাগরিক মধ্যবিত্তের চিত্র। উদীয়মান বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ছিল স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। ১৮৮১ সালেই বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমকালীন পত্রিকা *সোমপ্রকাশ* মন্তব্য করেছে। "আমাদের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া কৃতী হইবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মত হইবে, চেষ্টা আমাদিগের দেশের অন্ত:করণে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় স্থান প্রাপ্ত হয় না।"[২২] উনিশ শতকের জনপ্রিয় লেখক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত করতে গিয়ে বাঙালী বাবুদের সম্পর্কে তীব্র কটুক্তি প্রকাশ করেন। তার মতে,

> যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুন, মুখে দশগুন, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইস্টদেবতা ইংরাজ, গুরু বাক্ষধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ "ন্যাশনাল থিয়েটার", তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট বাক্ষ, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক বাক্ষণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষায় ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।[২৩]

এভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্ষোভ ও গ্লানি থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে চরিত্র চিহ্নিত করেছেন তাতে তার ক্ষোভ থাকলেও এ চিত্র বাঙালী মধ্যবিত্তদের খুব বেশী অতিরঞ্জিত ছিল না। এভাবে দেখা যায় ব্রিটিশ শক্তির অনুগত শক্তি হিসেবে বাংলায় যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ তাদের না ছিল জাতীয়তবোধ বা জাতীয়তাবাদ। দেশপ্রেম, মানব কল্যাণের কোন মনোভাবই তাদের মধ্যে বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে ছিল না। অবশ্য দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ শুরু থেকেই এই উপমহাদেশে ছিল না। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদাব মন্তব্য করেছেন,

> জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝায় ভারতবর্ষে তাহার অস্তিত্ব মধ্যযুগে ছিল না, প্রাচীন হিন্দু আমলেও ছিল কিনা সন্দেহ। .... যখন বাংলায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজশক্তি নেপাল, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিতে যুদ্ধযাত্রা করিত তখন বাঙালী নেতারা ইংরেজদের বিজয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং যুদ্ধে অর্থসাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতেন। উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রাজা রামমোহন রায়ও এই দলভুক্ত ছিলেন।[২৪]

এভাবে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ার প্রসিদ্ধ মনীষী রাজা রামমোহন রায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে অনন্য উদার মত পোষণ করিতেন কিন্তু তিনিও মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির উল্লেখ করে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইংরেজদের ভারতে পাঠিয়ে হিন্দুদের নয় শত বর্ষব্যাপী মুসলমান লাঞ্ছনা ও অত্যাচার থেকে উদ্ধার করেছেন।[২৫] এই সময়ের অপর বাঙালী মনীষী প্রসন্নকুমার ঠাকুরও একই মনোভাব প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করে বলেছেন, "ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও না ইংরেজের অধীন হইয়া থাকিতে চাও,

আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলিয়া গ্রহণ করিব।[২৬] এই মনোভাব কেবল মুষ্টিমেয় হিন্দু নেতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু বাঙালী জনসাধারণ উনিশ শতকে এই মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেন। এভাবে দেখা যায় যে, "জাতীয় চেতনা বা স্বাধীনতার প্রেরণা অন্ততঃ বাংলা দেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছিল না"[২৭] সময়ের সাথে সাথে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। আর এ পরিবর্তনের কারণ ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার। চলবে

সমাপ্য আগামী সংখ্যায়

ড. মর্ত্তুজা খালেদ, দঃ কোরিয়া, ১০/০৯/২০০৭

তরুন এই ইতিহাসবিদ লেখকের পরিচিতি জানতে এখানে টোকা মারুন

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন

তথ্যনির্দেশ

---

[1] Sang-Woo Rhee, "Four Normative Premises That Guide Korean Unification Policy," *Korea and World Affairs,* Vol. 23, No.4, Winter 1999, 519.

[2] ew¼gP›` P‡Ævcva¨vq, Ò‡mKvj Avi GKvjÓ ew¼g iPbvejx (†hv‡MkP›` evMj KZ„K m¤úvw`Z), (KwjKvZv: mvwnZ¨ msm`, 1390), c„344|

[3] Gg.G.iwng, *evsjvi mvgwRK I mvs¯wZK BwZnvm,* (XvKv: evsjv GKv‡Wgx, 1982),c„158|

[4] Aveyj Kv‡mg dRjyj nK, *Dwbk kZ‡Ki ga¨‡kYx I evOjv mvwnZ¨,* (XvKv: Avng` cvewjwks nvDm, 1988), c„43|

[5] H|

[6] nweeyj ingvb, *mev evsjvi f-AwfRvZZš,*(XvKv: evsjv GKv‡Wgx,2003), c„55-57|

[7] *H*, c„38-39|

[8] Jadunath Sarkar (edited), *The History of Bengal,* vol. II. (Dacca,1948), p. 497.

[9] wmivRyj Bmjvg, *evsjv‡`‡ki BwZnvm, 1704-1971*, 1g LÛ, (XvKv: GwkqwUK †mvmvBwU Ae evsjv‡`k, 1993), c„ fwgKv 3|

[10] *H*, c„ 4|

[11] Karl Marx, " The British Rule in India" in *Marx Engels*, (Moscow: Progress Publishers,1988),pp.13-16.

[12] mxgKvk ivq, *fvi‡Zi KlK we‡`vn I MYZwšK msMvg,* (KwjKvZv: wW Gb we ev`vm,1980), c„ 5|

[13] e`i"Ïxb Dgi, *wPi¯vqx e‡›`ve‡¯ evsjv‡`‡gi KlK,* (XvKv: glj v ev`vm, 1992), c„21-22.

[14] Av.d. mvjvnDÏxb Avbþ`, Ó Dwbk kZ‡K evsjvi ivR‰bwZK wPšv-‡PZbv I KgKvÛÓ, wmivRyj Bmjvg (m¤úvw`Z), evsjv‡`‡ki BwZnvm, *c‡ev³,* c„272|

[15] Agi `Ë, *Dwbk kZ‡Ki gmwjg gvbm I e½f½,* (KjKvZv: c‡Mwmf cvewjkvm, 2001), c„ 4|

[16] webq †Nvl, *evsjvi mvgwRK BwZnv‡mi aviv,* XvKv: ekKve, 2000, c„ 89|

[17] *H*|

[18] webq †Nvl, (*evOjvi weØrmgvR,* KjKvZv: 1973), c„ 15-18|

[19] webq ‡Nvl, ÓevOvjx ga¨weË †kYxi D™e I weKvkÓ D×Z„ n‡q‡Q mxeva Kgvi gyLvcva¨vq iwPZ *evOwj ga¨weË I Zvi gvbm †jvK,* (KjKvZv: c‡Mwmf cvewjkvm,1980), c„ 101|

[20] webq †Nvl, *c‡ev³,* c„ 165|

[21] A Griffin, *Sketches of Calcutta Etc,* (Glasgow,1843), pp.45-46. D×Z„ n‡q‡Q webq †Nvl, *c‡ev³,* c„148-49|

[22] D×Z„ n‡q‡Q webq †Nvl, *c‡ev³,* c„ 170|

[23] ew¼gP›` P‡Ævcva¨vq, Òevey Ó *†jvKinm¨* ew¼g iPbvejx c‡ev³, c„ 12|

[24] kxi‡gkP›` gRyg`vi, evsjv †`‡ki BwZnvm, ZZxq LÛ, (†Rbv‡ij cvewjkvm, 1981), c„ 496|

[25] H, c„ 499|

[26] D×Z„ n‡q‡Q, kxi‡gkP›` gRyg`vi, *H*|

[27] *H*|